চিরায়ত বই

১৩

গণদেবতা

গণদেবতা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গণদেবতা
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২২

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল
বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ৪০০ টাকা

Ganadebata a novel by Tarasankar Bandyopadhyay Published by
Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: December 2022
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US$ 20
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-96871-5-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী
করকমলেষু

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার লাভপুরে, ১৮৯৮ সালের ২৩ জুলাই। কলেজ ছেড়ে মহাত্মা গান্ধির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দান। কারাবরণ করেছেন একাধিকবার। আজীবন কংগ্রেসি রাজনীতিতে আস্থাশীল, ছিলেন আইন প্রণেতাও। বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক। লিখেছেন ৬৫টি উপন্যাস, ৫৩টি ছোটগল্প-সংকলন, ১২টি নাটক, ৪টি প্রবন্ধ-সংকলন, ৪টি স্মৃতিকথা, ২টি ভ্রমণকাহিনি, ১টি কাব্যগ্রন্থ এবং ১টি প্রহসন।

আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসের জন্য ১৯৫৫ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' ও ১৯৫৬ সালে 'সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার' পান। ১৯৬৭ সালে *গণদেবতা* উপন্যাসের জন্য 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার'। ১৯৬২ সালে 'পদ্মশ্রী', ১৯৬৮ সালে 'পদ্মভূষণ' সম্মানেও বিভূষিত হন তিনি। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'শরৎস্মৃতি পুরস্কার' (১৯৪৭) ও 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' (১৯৫৬)-এ সম্মানিত। তাঁর চল্লিশটি রচনা চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। যাদের অন্যতম *সপ্তপদী*, *দুই পুরুষ*, *গণদেবতা*, *আরোগ্য নিকেতন*, *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*, *অভিযান* ও *জলসাঘর*।

রাঢ়ের মানুষের জীবনচিত্র, ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম, মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বে পুঁজির বিজয়– সর্বোপরি নবভারত ছিল তারাশঙ্করের সাহিত্য সাধনার মূল বিষয়বস্তু।

দাম্পত্যসঙ্গী : উমাশশী দেবী। মৃত্যু : ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সালে।

এক

কারণ সামান্যই। সামান্য কারণেই গ্রামে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। এখানকার কামার অনিরুদ্ধ কর্মকার ও ছুতার গিরিশ সূত্রধর নদীর ওপারে বাজারে-শহরটায় গিয়া একটা করিয়া দোকান ফাঁদিয়াছে। খুব ভোরে উঠিয়া যায় ফেরে রাত্রি দশটায়; ফলে গ্রামের লোকের অসুবিধার আর শেষ নাই। এবার চাষের সময় কী নাকালটাই যে তাদের হইতে হইয়াছে, সে তাহারাই জানে। লাঙলের ফাল পাঁজানো, গাড়ির হাল বাঁধার জন্য চাষিদের অসুবিধার আর অন্ত ছিল না। গিরিশ ছুতারের বাড়িতে গ্রামের লোকের বাবলা কাঠের গুঁড়ি আজও স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে সেই গত বৎসরের ফাল্গুন-চৈত্র হইতে; কিন্তু আজও তাহারা নূতন লাঙল পাইল না।

এ ব্যাপার লইয়া অনিরুদ্ধ এবং গিরিশের বিরুদ্ধে অসন্তোষের সীমা ছিল না। কিন্তু চাষের সময় ইহা লইয়া একটা জটলা করিবার সময় কাহারও হয় নাই, প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া কার্যোদ্ধার করা হইয়াছে; রাত্রি থাকিতে উঠিয়া অনিরুদ্ধর বাড়ির দরজায় বসিয়া থাকিয়া, তাহাকে আটক করিয়া লোকে আপন আপন কাজ সারিয়া লইয়াছে; জরুরি দরকার থাকিলে, ফাল লইয়া, গাড়ির চাকা ও হাল গড়াইয়া গড়াইয়া সেই শহরের বাজার পর্যন্তও লোকে ছুটিয়াছে। দূরত্ব প্রায় চার মাইল—কিন্তু ময়ূরাক্ষী নদীটাই একা বিশ ক্রোশের সমান। বর্ষার সময় ভরানদীর খেয়াঘাটে পারাপারে দেড় ঘণ্টা কাটিয়া যায়। শুকনার সময়ে যাওয়া-আসায় আট মাইল বালি ঠেলিয়া গাড়ির চাকা গড়াইয়া লইয়া যাওয়া সোজা কথা নয়। একটু ঘুর-পথে নদীর উপর রেলওয়ে ব্রিজ আছে; কিন্তু লাইনের পাশের রাস্তাটা এমন উঁচু ও অল্পপরিসর যে গাড়ির চাকা গড়াইয়া লইয়া যাওয়া প্রায় অসম্ভব।

এখন চাষ শেষ হইয়া আসিল। মাঠে ফসল পাকিয়া উঠিয়াছে—এখন কাস্তে চাই। কামার চিরকাল লোহা-ইস্পাত লইয়া কাস্তে গড়িয়া দেয়—পুরনো কাস্তেতে শান লাগাইয়া পুরি কাটিয়া দেয়; ছুতার বাঁট লাগাইয়া দেয়। কিন্তু কামার-ছুতার সেই একই চালে চলিয়াছে; যে অনিরুদ্ধের হাত পার হইয়াছে, সে গিরিশের হাতে দুঃখ ভোগ করিতেছে। শেষ পর্যন্ত গ্রামের লোক এক হইয়া পঞ্চায়েত-মজলিস ডাকিয়া বসিল। কেবল একখানা গ্রাম নয়, পাশাপাশি দুখানা গ্রামের লোক একত্র হইয়া গিরিশ ও অনিরুদ্ধকে একটি নির্দিষ্ট দিন জানাইয়া ডাকিয়া পাঠাইল। গ্রামের শিবতলায় বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে মজলিস বসিল। মন্দিরের ময়ূরেশ্বর শিব, পাশেই ভাঙা

চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামদেবী মা ভাঙা-কালীর বেদি। কালী-ঘর যতবার তৈয়ারি হইয়াছে, ততবারই ভাঙিয়াছে—সেই হেতু কালীর নাম ভাঙা-কালী। চণ্ডীমণ্ডপটিও বহুকালের এবং এক কোণ ভাঙা হইয়া আছে; মধ্যে নাটমন্দির। তার চাল কাঠামো হাতিগুঁড়-ষড়দল-তীরসাঙা প্রভৃতি হরেক রকমের কাঠ দিয়া যেন অক্ষয় অমর করিবার উদ্দেশ্যে গড়া হইয়াছিল। নিচের মেঝেও সনাতন পদ্ধতিতে মাটির। এই চণ্ডীমণ্ডপের এই নাটমন্দিরে বা আটচালায় শতরঞ্জি, চাটাই, চট প্রভৃতি বিছাইয়া মজলিস বসিল।

গিরিশ, অনিরুদ্ধ এ ডাকে না আসিয়া পারিল না। যথাসময়ে তাহারা দুজনে আসিয়া উপস্থিত হইল। মজলিসে দুইখানা গ্রামের মাতব্বর লোক একত্র হইয়াছিল; হরিশ মণ্ডল, ভবেশ পাল, মুকুন্দ ঘোষ, কীর্তিবাস মণ্ডল, নটবর পাল—ইহারা সব ভারিক্কি লোক, গ্রামের মাতব্বর সদ্‌গোপ চাষি। পাশের গ্রামের দ্বারকা চৌধুরীও উপস্থিত হইয়াছে। চৌধুরী বিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তি, এ অঞ্চলে বিশেষ মাননীয় জন। আচার-ব্যবহার বিচার-বুদ্ধির জন্য সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। লোকে এখনও বলে—কেমন বংশ দেখতে হবে! এই চৌধুরীর পূর্বপুরুষেরাই এককালে এই দুইখানি গ্রামের জমিদার ছিলেন; এখন ইনি অবশ্য সম্পন্ন চাষিরূপেই গণ্য, কারণ জমিদারি অন্য লোকের হাতে গিয়াছে। আর ছিল দোকানি বৃন্দাবন দত্ত—সেও মাতব্বর লোক। মধ্যবিত্ত অবস্থার অল্পবয়স্ক চাষি গোপেন পাল, রাখাল মণ্ডল, রামনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতিও উপস্থিত ছিল। এ-গ্রামের একমাত্র ব্রাহ্মণ বাসিন্দা হরেন্দ্র ঘোষাল—ও-গ্রামের নিশি মুখুজ্জে, পিয়ারী বাঁড়ুজ্জে—ইহারাও একদিকে বসিয়াছিল।

আসরের প্রায় মাঝখানে জাঁকিয়া বসিয়াছিল ছিরু পাল; সে নিজেই আসিয়া জাঁকিয়া আসন লইয়াছিল। ছিরু বা শ্রীহরি পালই এই দুইখানা গ্রামের নূতন সম্পদশালী ব্যক্তি। এ অঞ্চলের মধ্যে বিশিষ্ট ধনী যাহারা, ছিরু ধন-সম্পদে তাহাদের কাহারও চেয়ে কম নয়—এই কথাই লোকে অনুমান করে। লোকটার চেহারা প্রকাণ্ড; প্রকৃতিতে ইতর এবং দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। সম্পদের জন্য যে প্রতিষ্ঠা সমাজ মানুষকে দেয়, সে প্রতিষ্ঠা ঠিক ঐ কারণেই ছিরুর নাই। অভদ্র, ক্রোধী, গোঁয়ার, চরিত্রহীন, ধনী ছিরু, পালকে লোকে বাহিরে সহ্য করিলেও মনে মনে ঘৃণা করে, ভয় করিলেও সম্পদোচিত সম্মান কেহ দেয় না। এ জন্য ছিরুর ক্ষোভ আছে, লোকে তাহাকে সম্মান করে না বলিয়া সেও সকলের উপর মনে মনে রুষ্ট। প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা জোর করিয়া আদায় করিতে সে বদ্ধপরিকর। তাই সাধারণের সামাজিক মজলিস হইলেই ঠিক মাঝখানে আসিয়া সে জাঁকিয়া বসে।

আর একটি সবলদেহ দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ যুবা নিতান্ত নিস্পৃহের মত এক পাশে থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে দেবনাথ ঘোষ—এই গ্রামেরই সদ্‌গোপ চাষির ছেলে। দেবনাথ নিজ হাতে চাষ করে না, স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত সে। এ মজলিসে আসিবার বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলেও সে আসিয়াছে; অনিরুদ্ধের যে অন্যায় সে অন্যায়ের মূল

কোথায় সে জানে। ছিরু পালের মত ব্যক্তি যে মজলিসে মধ্যমণির মত জমকাইয়া বসে, সে মজলিসে তাহার আস্থা নাই বলিয়া এই নিস্পৃহতা, নীরব অবজ্ঞার সহিত সে একপাশে থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আসে নাই কেবল ও-গ্রামের কৃপণ মহাজন মৃত রাখহরি চক্রবর্তীর পোষ্যপুত্র হেলারাম চাটুজ্জে ও গ্রাম্য ডাক্তার জগন্নাথ ঘোষ। গ্রামের চৌকিদার ভূপাল লোহারও উপস্থিত ছিল। আশপাশে ছেলেদের দল গোলমাল করিতেছিল, একেবারে একপ্রান্তে গ্রামের হরিজন চাষিরাও দাঁড়াইয়া দর্শক হিসাবে। ইহারাই গ্রামের শ্রমিক চাষি—অসুবিধার প্রায় বার-আনা ভোগ করিতে হয় ইহাদিগকেই।

অনিরুদ্ধ এবং গিরিশ আসিয়া মজলিসে বসিল। বেশভূষা অনেকটা পরিচ্ছন্ন এবং ফিটফাট—তাহার মধ্যে শহরে ফ্যাশনের ছাপ সুস্পষ্ট; দুজনেই সিগারেট টানিতে টানিতে আসিতেছিল—মজলিসের অনতিদূরেই ফেলিয়া দিয়া মজলিসের মধ্যে আসিয়া বসিল।

অনিরুদ্ধ কথা আরম্ভ করিল; বসিয়াই হাত দিয়া একবার মুখটা বেশ করিয়া মুছিয়া লইয়া বলিল—কই গো, কী বলছেন বলুন। আমরা খাটি-খুঁটি খাই; আমাদের আজ এ বেলাটাই মাটি।

কথার ভঙ্গিমায় ও সুরে সকলেই একটু চকিত হইয়া উঠিল, যেন ঝগড়া করিবার মতলবেই কোমর বাঁধিয়া আসিয়াছে; প্রবীণের দলের মধ্যে সকলেই একবার সশব্দে গলা ঝাড়িয়া লইল। অল্পবয়সীদের ভিতর হইতে যেন একটা আগুন দপ করিয়া উঠিল; ছিরু ওরফে শ্রীহরি বলিয়া উঠিল—মাটিই যদি মনে কর, তবে আসবারই বা কী দরকার ছিল?

হরেন্দ্র ঘোষাল কথা বলিবার জন্য হাঁকপাঁক করিতেছিল; সে বলিল—তেমন মনে হলে এখনও উঠে যেতে পার তোমরা। কেউ ধরে নিয়েও আসে নাই, বেঁধেও রাখে নাই তোমাদিগে।

হরিশ মণ্ডল এবার বলিল—চুপ কর তোমরা। এখানে যখন ডাকা হয়েছে, তখন আসতেই হবে। তা তোমরা এসেছ, বেশ কথা—ভাল কথা, উত্তম কথা। তারপর এখন দুপক্ষে কথাবার্তা হবে, আমাদের বলবার যা বলব—তোমাদের জবাব যা তোমরা দেবে; তারপর তার বিচার হবে। এত তাড়াতাড়ি করলে হবে কেন? ঘোড়া দুটো বাঁধো।

গিরিশ বলিল—তা হলে কথা আপনাদের আমাদিগে নিয়েই?

অনিরুদ্ধ বলিল—তা আমরা আঁচ করেছিলাম। তা বেশ, কী কথা আপনাদের বলুন? আমাদের জবাব আমরা দোব। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন—আপনারা সবাই যখন একজোট হয়েছেন, তখন এ-কথার বিচার করবে কে? নালিশ যখন আপনাদের, তখন আপনারা বিচার কী করে করবেন—এ তো আমরা বুঝতে পারছি না।

দ্বারকা চৌধুরী অকস্মাৎ গলা ঝাড়িয়া শব্দ করিয়া উঠিল; চৌধুরীর কথা বলিবার এটি পূর্বাভাস। উচ্চ গলা-ঝাড়ার শব্দে সকলে চৌধুরীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। চৌধুরীর চেহারায় এবং ভঙ্গিমাতে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে।

গৌরবর্ণ রং সাদা ধবধবে গোঁফ, আকৃতিতে দীর্ঘ। মানুষটি আসরের মধ্যে আপনা-আপনি বিশিষ্ট হইয়া বসিয়াছিল। সে এবার মুখ খুলল—দেখ কর্মকার, কিছু মনে কোরো না বাপু, আমি একটা কথা বলব। গোড়া থেকেই তোমাদের কথাবার্তার সুর শুনে মনে হচ্ছে যেন তোমরা বিবাদ করবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছ! এটা তো ভাল নয় বাবা। বস স্থির হয়ে বস।

অনিরুদ্ধ এবার সবিনয়ে ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল—বেশ, বলুন কী বলছেন।

হরিশ মণ্ডলই আরম্ভ করিল—দেখ বাপু, খুলে বলতে গেলে মহাভারত বলতে হয়। সংক্ষেপেই বলছি—তোমরা দুজনে শহরে গিয়ে আপন আপন ব্যবসা করতে বসেছ। বেশ করেছ। যেখানে মানুষ দুটো পয়সা পাবে সেখানেই যাবে। তা যাও। কিন্তু এখানকার পাঠ যে একেবারে তুলে দেবে, আর আমরা যে এই দু কোশ রাস্তা জিনিসপত্র ঘাড়ে করে নিয়ে ছুটব ওই নদী পার হয়ে, তা তো হবে না বাপু। এবার যে তোমরা আমাদের কী নাকাল করেছ সে কথাটা ভেবে দেখ দেখি মনে মনে।

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে, তা অসুবিধে একটুকুন হয়েছে আপনাদের।

ছিরু বা শ্রীহরি গর্জিয়া উঠিল—একটুকুন! একটুকুন কী হে? জান, জমিতে জল থাকতে ফল পাঁজানোর অভাবে চাষ বন্ধ রাখতে হয়েছে? তোমারও তো জমি আছে, জমির মাথায় একবার ঘুরে দেখে এস দেখি পটপটি ঘাসের ধুমটা। ভাল ফালের অভাবে চাষের সময় একটি পটপটিরও শেকড় ভাল ওঠে নাই। বছর সাল তোমরা ধানের সময় ধানের জন্যে বস্তা হাতে করে এসে দাঁড়াবে, আর কাজের সময় তখন শহরে গিয়ে বসে থাকবে—তা করলে হবে কেন?

হরেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া উঠিল এই ক-থা! এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতে একটা তালি বাজাইয়া দিয়া বসিল।

মজলিসসুদ্ধ সকলেই প্রায় সমস্বরে বলিল—এই।

প্রবীণেরাও ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। অর্থাৎ এই।

অনিরুদ্ধ এবার খুব সপ্রতিভ ভঙ্গিতে নড়িয়াচড়িয়া জাঁকিয়া বসিয়া বলিল—এই তো আপনাদের কথা? আচ্ছা, এইবার আমাদের জবাব শুনুন! আপনাদের ফাল পাঁজিয়ে দিই, হাল লাগিয়ে দিই চাকায়, কাস্তে গড়ে দিই, আপনারা আমাকে ধান দেন হালপিছু কাঁচি পাঁচ শলি। আমাদের গিরিশ সূত্রধর—

বাধা দিয়া ছিরু পাল বলিল—গিরিশের কথায় তোমার কাজ কী হে বাপু?

কিন্তু ছিরু কথা শেষ করিতে পারিল না; দ্বারকা চৌধুরী বলিল—বাবা শ্রীহরি, অনিরুদ্ধ তো অন্যায় কিছু বলে নাই। ওদের দুজনের একই কথা। একজন বললেও তো ক্ষতি নাই কিছু।

ছিরু চুপ করিয়া গেল। অনিরুদ্ধ ভরসা পাইয়া বলিল—চৌধুরীমশায় না থাকলে কি মজলিসের শোভা হয়—উচিত কথা বলে কে?

—বল অনিরুদ্ধ কী বলছিলে, বল!

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমার, মানে কর্মকারের হালপিছু পাঁচ শলি, আর সূত্রধরের হালপিছু চার শলি করে ধান বরাদ্দ আছে। আমরা এতদিন কাজও করে আসছি, কিন্তু চৌধুরীমশাই, ধান আমরা ঠিক হিসেবমত প্রায়ই পাই না।

—পাও না?

—আজ্ঞে না।

গিরিশও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল—আজ্ঞে না। প্রায় ঘরেই দু-চার আড়ি করে বাকি রাখে, বলে, দু-দিন পরে দোব, কি আসছে বছর দোব। তারপর সে ধান আমরা পাই না।

ছিরু সাপের মত গর্জিয়া উঠিল—পাও না? কে দেয় নি শুনি? মুখে পাই না বললে তো হবে না। বল, কার কাছে পাবে তোমরা?

অনিরুদ্ধ দুরন্ত ক্রোধে বিদ্যুদ্‌গতিতে ঘাড় ফিরাইয়া শ্রীহরির দিকে চাহিয়া বলিল—কার কাছে পাব? নাম করতে হবে? বেশ, বলছি।—তোমার কাছেই পাব।

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ তোমার কাছে। দিয়েছ ধান তুমি দু বছর? বল?

—আর আমি যে তোমার কাছে হ্যান্ডনোটে টাকা পাব। তাতে ক'টাকা উসুল দিয়েছ শুনি?

ধান দিই নাই...মজলিসের মধ্যে তুমি যে এত বড় কথাটা বলছ!

—কিন্তু তার তো একটা হিসেব-নিকেশ আছে? ধানের দামটা তোমার হ্যান্ডনোটের পিঠে উসুল দিতে তো হবে—নাকি? বলুন চৌধুরীমশায়, মণ্ডলমশাইরাও তো রয়েছেন, বলুন না।

চৌধুরী বলিল—শোন চুপ কর একটু। শ্রীহরি, তুমি বাবা হ্যান্ডনোটের পিঠে টাকাটা উসুল দিয়ে নিয়ো। আর অনিরুদ্ধ, তোমরা একটা বাকির ফর্দ তুলে হরিশ মণ্ডলমশায়কে দাও। এ নিয়ে মজলিসে গোল করাটা তো ভাল নয়। ওঁরাই সব আদায়-পত্র করে দেবেন। আর তোমরাও গাঁয়ে একটা করে পাট রাখ। যেমন কাজকর্ম করছিলে তেমনি কর।

মজলিসসুদ্ধ সকলেই এ কথায় সায় দিল। কিন্তু অনিরুদ্ধ এবং গিরিশ চুপ করিয়া রহিল, ভাবে-ভঙ্গিতেও সম্মতি বা অসম্মতি কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিল না।

এতক্ষণে দেবনাথ মুখ খুলিল; প্রবীণ চৌধুরীর এ মীমাংসা তাহার ভাল লাগিয়াছে। অনিরুদ্ধ-গিরিশের পাওনা অনাদায়ের কথা সে জানিত বলিয়াই তাহার প্রথমে মনে হইয়াছিল—অনিরুদ্ধ এবং গিরিশের উপর মজলিস অবিচার করিতে বসিয়াছে। নতুবা গ্রামের সমাজ-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবারই সে পক্ষপাতী; তাহার নিজের একটি নিয়ম-শৃঙ্খলার ধারণা আছে। সেই ধারণা অনুযায়ী আজ দেবু খুশি হইল; অনিরুদ্ধ ও গিরিশের এবার নত হওয়া উচিত বলিয়া তাহার মনে হইল। সে বলিল—অনি ভাই, আর তো তোমাদের আপত্তি করা উচিত নয়।

চৌধুরী প্রশ্ন করিল—অনিরুদ্ধ?

—আজ্ঞে।

—কী বলছ বল।

এবার হাত জোড় করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে, আমাদিগে মাপ করুন আপনারা। আমরা আর এভাবে কাজ চালাতে পারছি না।

মজলিসে এবার অসন্তোষের কলরব উঠিয়া গেল।

—কেন?

—না পারবার কারণ?

—পারব না বললে হবে কেন?

—চালাকি নাকি?

—গাঁয়ে বাস কর না তুমি?

ইহার মধ্যে চৌধুরী নিজের দীর্ঘ হাতখানি তুলিয়া ইঙ্গিত প্রকাশ করিল—চুপ কর, থাম।

হরিশ বিরক্তিভাবে বলিল—থামরে বাপু ছোঁড়ারা; আমরা এখনও মরি নাই।

হরেন্দ্র ঘোষাল অল্পবয়সী ছোকরা এবং ম্যাট্রিক পাস এবং ব্রাহ্মণ। সেই অধিকারে সে প্রচণ্ড একটা চিৎকার করিয়া উঠিল—এইও! সাইলেন্স—সাইলেন্স!

অবশেষে দ্বারকা চৌধুরী উঠিয়া দাঁড়াইল। এবার ফল হইল। চৌধুরী বলিল—চিৎকার করে গোলমাল বাধিয়ে তো ফল হবে না! বেশ তো, কর্মকার কেন পারবে না—বলুক। বলতে দাও ওকে।

সকলে এবার নীরব হইল। চৌধুরী আবার বসিয়া বলিল—কর্মকার, পারবে না বললে তো হবে না বাবা। কেন পারবে না, বল! তোমরা পুরুষানুক্রমে করে আসছ। আজ পারব না বললে গ্রামের ব্যবস্থাটা কী হবে?

দেবনাথ বলিল—অন্যায়। অনিরুদ্ধ ও গিরিশের এ মহা অন্যায়।

হরিশ বলিল—তোমার পূর্বপুরুষের বাস হল গিয়ে মহাগ্রামে; এ গ্রামে কামার ছিল না বলেই তোমার পিতামহকে এনে বাস করানো হয়েছিল। সে তো তুমিও শুনেছ হে বাপু। এখন না বললে চলবে কেন?

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে, মোড়ল জ্যাঠা, তা হলে শুনুন। চৌধুরীমশায় আপনি বিচার করুন। এ গাঁয়ে আগে কত হাল ছিল ভেবে দেখুন। কত ঘরে হাল উঠে গিয়েছে তাও দেখুন। এই ধরুন গদাই, শ্রীনিবাস, মহেন্দ্র—আমি হিসেব করে দেখেছি, আমার চোখের ওপর এগারটি ঘরের হাল উঠে গিয়েছে। জমি গিয়ে ঢুকেছে কঙ্কণার ভদ্রলোকদের ঘরে। কঙ্কণায় কামার আলাদা। আমাদের এগারখানা হালের ধান কমে গিয়েছে। তারপরে ধরুন—আমরা চাষের সময় কাজ করতাম লাঙলের—গাড়ির, অন্য সময়ে গাঁয়ের ঘরদোর হত। আমরা পেরেক গজাল হাতা খুন্তি গড়ে দিতাম—বঁটি কোদাল কুড়ুল গড়তাম—গাঁয়ের লোকে কিনত। এখন গাঁয়ের লোকে সেসব কিনছেন বাজার থেকে। সস্তা পাচ্ছেন—তাই কিনছেন। আমাদের গিরিশ

গাড়ি গড়ত, দরজা তৈরি করত; ঘরের চালকাঠামো করতে গিরিশকেই লোকে ডাকত। এখন অন্য জায়গা থেকে সস্তায় মিস্ত্রি এনে কাজ হচ্ছে। তারপর—ধরুন—ধানের দর পাঁচ সিকে—দেড় টাকা, আর অন্য জিনিসপত্র আক্রা। এতে আমাদের এই নিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকলে কী করে চলে, বলুন? ঘর-সংসার যখন করছি—তখন ঘরের লোকের মুখে তো দুটো দিতে হবে। তার ওপর ধরুন, আজকালকার হাল-চাল সে রকম নেই—

ছিরু এতক্ষণ ধরিয়া মনে মনে ফুলিতেছিল, সে সুযোগ পাইয়া বাধা দিয়া কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল—তা বটে, আজকাল বার্নিশ-করা জুতো চাই, লম্বা লম্বা জামা চাই, সিগারেট চাই—পরিবারের শেমিজ চাই, বডিস চাই—

—এই দেখ ছিরু মোড়ল, তুমি একটু হিসেব করে কথা বলবে। অনিরুদ্ধ এবার কঠিন স্বরে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

ছিরু বারকতক হেলিয়া-দুলিয়া বলিয়া উঠিল, হিসেব আমার করাই আছে রে বাপু। পঁচিশ টাকা ন আনা তিন পয়সা। আসল দশ টাকা, সুদ পনের টাকা ন আনা তিন পয়সা। তুই বরং কষে দেখতে পারিস। শুভংকরী জানিস তো?

হিসাবটা অনিরুদ্ধের নিকট পাওনা হ্যান্ডনোটের হিসাব। অনিরুদ্ধ কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল—সমস্ত মজলিসের দিকে একবার সে চাহিয়া দেখিল। সমস্ত মজলিসটাও এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। অনিরুদ্ধ মজলিস হইতে উঠিয়া পড়িল।

ছিরু ধমক দিয়া উঠিল—যাবে কোথা তুমি?

অনিরুদ্ধ গ্রাহ্য করিল না, সে চলিয়া গেল।

চৌধুরী এতক্ষণে বলিল—শ্রীহরি!

ছিরু বলিল—আমাকে চোখ রাঙাবেন না চৌধুরীমশায়, দুই-তিনবার আপনি আমাকে থামিয়ে দিয়েছেন, আমি সহ্য করেছি। আর কিন্তু আমি সহ্য করব না।

চৌধুরী এবার চাদরখানি ঘাড়ে ফেলিয়া বাঁশের লাঠিটা লইয়া উঠিল; বলিল— চললাম গো তা হলে। ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম—আপনাদিগে নমস্কার।

এই সময়ে গ্রামের পাতুলাল মুচি জোড়হাত করিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—চৌধুরী মহাশয়, আমার একটুকুন বিচার করে দিতে হবে।

চৌধুরী সন্তর্পণে মজলিস হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিয়া বলিল—বল বাবা, এরা সব রয়েছেন, বল!

—চৌধুরীমশায়!

চৌধুরী এবার চাহিয়া দেখিল—অনিরুদ্ধ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

—একবার বসতে হবে চৌধুরী মশায়! ছিরু পালের টাকাটা আমি এনেছি— আপনারা থেকে কিন্তু আমার হ্যান্ডনোটটা ফেরতের ব্যবস্থা করে দিন।

মজলিসসুদ্ধ লোক এতক্ষণে সচেতন হইয়া চৌধুরীকে ধরিয়া বসিল। কিন্তু চৌধুরী কিছুতেই নিরস্ত হইল না, সবিনয়ে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

অনিরুদ্ধ পঁচিশ টাকা দশ আনা মজলিসের সম্মুখে রাখিয়া বলিল—এখনই হ্যান্ডনোটখানা নিয়ে এস ছিরু পাল!

পরে হ্যান্ডনোটখানি ফেরত লইয়া বলিল—ও একটা পয়সা আমাকে আর ফেরত দিতে হবে না। পান কিনে খেয়ো। এস হে গিরিশ, এস।

হরিশ বলিল—ওই, তোমরা চললে যে হে? যার জন্যে মজলিস বসল—

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা আর ও কাজ করব না মশায়, জবাব দিলাম। যে মজলিস ছিরু মোড়লকে শাসন করতে পারে না, তাকে আমরা মানি না।

তাহারা হনহন করিয়া চলিয়া গেল। মজলিস ভাঙিয়া গেল।

পরদিন প্রাতেই শোনা গেল, অনিরুদ্ধের দুই বিঘা বাকুড়ির আধ-পাকা ধান কে বা কাহারা নিঃশেষে কাটিয়া তুলিয়া লইয়াছে।

দুই

অনিরুদ্ধ ফসলশূন্য ক্ষেত্রখানার আইলের উপর স্থিরদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ দেখিল। নিষ্ফল আক্রোশে তাহার লোহা-পেটা হাত দুখানা মুঠা বাঁধিয়া ডাইস- যন্ত্রের মত কঠোর করিয়া তুলিল। তাহার পর সে অত্যন্ত দ্রুতপদে বাড়ি ফিরিয়া হাতকাটা জামাটা টানিয়া সেটার মধ্যে মাথা গলাইতে গলাইতে বাহির দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

অনিরুদ্ধের স্ত্রীর নাম পদ্মমণি—দীর্ঘাঙ্গী পরিপূর্ণ-যৌবনা কালো মেয়েটি। টিকালো নাক, টানা-টানা ভাসা-ভাসা ডাগর দুটি চোখ। পদ্মের রূপ না থাক, শ্রী আছে। পদ্মের দেহে অদ্ভুত শক্তি, পরিশ্রম করে সে উদয়াস্ত। তেমনি তীক্ষ্ণ তাহার সাংসারিক বুদ্ধি। অনিরুদ্ধকে এইভাবে বাহির হইতে দেখিয়া সে স্বামী অপেক্ষাও দ্রুতপদে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—চললে কোথায়?

রূঢ়দৃষ্টিতে চাহিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—ফিঙের মত পেছনে লাগিল কেন? যেখানে যাই না, তোর সে খোঁজে কাজ কী?

হাসিয়া পদ্ম বলিল—পেছনে লাগি নাই। তার জন্য সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আর, খোঁজে আমার দরকার আছে বইকি। মারামারি করতে যেতে নাই, থানা যাচ্ছি, পথ ছাড়!

—থানা? পদ্মর কণ্ঠস্বরের মধ্যে উদ্বেগ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

—হ্যাঁ, থানা। শালা ছিরে চাষার নামে আমি ডাইরি করে আসব। রাগে অনিরুদ্ধের কণ্ঠস্বর রণ-রণ করিতেছিল।